Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 175- 183
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.095

পুষ্কর দাশগুপ্ত ও কবিতার দৃশ্যরূপ সংক্রান্ত কিছু ভাবনা

চৈতালি ঘোষ, *গবেষক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2026; Accepted: 27.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Pushkar Dasgupta, the chief theoretician of the Shruti movement, was a notable poet of the 1960s. His ideas regarding poetic form and typographic layout created a significant stir in the literary world. Inspired by Mallarmé, Cummings, and Apollinaire, Dasgupta established a new sensibility through his creations and literary activism. This essay examines how he shaped the visual dimensions of poetry through his work.

Keywords: Visual poetry, typographic layout, Shruti magazine, manifesto, Pushkar Dasgupta

ছয়ের দশকে বাংলা কাব্য-সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম পুষ্কর দাশগুপ্ত (২৮ মার্চ ১৯৪১-৩০ আগস্ট ২০২৩)। পঞ্চাশের কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্তর্মুখীনতায় নিমগ্ন এবং বিশেষ কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা আন্দোলনের মধ্যে যাননি। অথচ ছয়ের দশক পুরোটাই কাব্যভাষার নানা পরীক্ষা ও আন্দোলনে সামিল হয়েছে নতুনতর কোনো উন্মোচনের জন্য। ছয়ের দশক এই কারণে উজ্জ্বল, এই কারণে বর্ণময়।[১] ছয়ের দশকের এইসব কাব্য-আন্দোলন মূলত এক-একটি পত্রিকা-গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। কবি ও প্রাবন্ধিক পুষ্কর দাশগুপ্ত বাংলা ভাষায় সাহিত্য-আন্দোলন অভিমুখী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতার দৃশ্যরূপে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ 'বরফি'-আকারে বা অমিয় চক্রবর্তী অসম পঙ্‌ক্তি-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে কবিতার অবয়বে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করলেও প্রথম তাত্ত্বিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কবিতার আঙ্গিকে, দৃশ্যরূপগত ভাবনায় অভিনবত্ব এনেছিলেন পুষ্কর দাশগুপ্ত। শ্রুতি পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত আন্দোলনে তিনি সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে পেয়েছিলেন পরেশ মন্ডল, মৃণাল বসুচৌধুরী, অনন্ত দাশ, সজল বন্দোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, অমরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ কবিদের। ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে প্রকাশিত মোট চোদ্দটি সংখ্যায় দৃশ্যরূপ তথা বৈচিত্র্যপূর্ণ মুদ্রণ-বিন্যাসকে প্রাধান্য দিয়ে অনেক কবিতা রচিত হয়েছে শ্রুতির পাতায়। কবি পুষ্কর দাশগুপ্ত ছিলেন শ্রুতি আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতা। শ্রুতির তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত তিনটি ইশতেহার (জুলাই ১৯৬৬, জানুয়ারি ১৯৬৮, মার্চ ১৯৬৯) থেকে কবিতার আঙ্গিক কেমন হবে সে সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়, যা বহুলাংশে ছিল পুষ্কর দাশগুপ্তের মস্তিষ্কপ্রসূত। পুষ্কর দাশগুপ্ত শ্রুতির প্রথম সংকলনে (এপ্রিল, ১৯৬৫) 'কবিতা সম্পর্কে' বলেছিলেন-

> জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজ-চিন্তার স্থান যেখানেই হোক কবিতায় নয়। কবিতা কবির উপলব্ধি বা আত্মিক অভিজ্ঞতার প্রকাশ...কবিতার সার্থকতা বিচার করে পাঠকের মন। শব্দের সংকেতে

> কবি তার উপলব্ধিকে উপস্থাপিত করে...আবার কবির দিক থেকে উপলব্ধির প্রকাশকে সঞ্চারণক্ষম করে তোলার ক্ষমতা এবং নৈপুণ্যের প্রয়োজন। প্রকাশ শিল্পের বহিরঙ্গ কিন্তু অপ্রধান নয়। উপলব্ধির যথাযথ প্রকাশ না ঘটলে কবিতা সার্থক হয় না।[২]

চিৎকার বা বক্তৃতা এ-দুটোর কোনোটিই যে কবিতা নয় এবং সংকেতের মাধ্যমেই উপলব্ধির ব্যঞ্জনা সম্ভব— একথা তরুণ প্রজন্মের কবিদের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। শব্দকে প্রয়োজন অনুসারে ব্যাকরণগত বিন্যাস থেকে মুক্ত করে প্রয়োগ, সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময় চিত্রকল্প রচনা, ছন্দ এবং কবিতার বিন্যাস সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রভৃতি আত্মস্থ কবিতা থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাই অন্তঃসারশূন্য আবদ্ধ অবস্থার থেকে কবিতাকে মুক্তি দিতে তিনি আঙ্গিককেই বেছে নিয়েছিলেন উপায় হিসাবে—

> কবির আত্মিক অভিজ্ঞতার গভীরতর পর্যায়ে অন্বেষণ এবং নব নব আত্মস্থ আবিষ্কারকে সংকেতিত করার জন্য দরকার উপযুক্ত, নবতর আঙ্গিক।[৩]

এই সমস্যা থেকে সমাধানের উপায়স্বরূপ বললেন-

> ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন...তৈরি করতে হবে ব্যক্তিগত এবং অনন্য এক প্রচলমুক্ত বাক্‌রীতি। আমরা চাই নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে। প্রচলিত ধারণা আর তৈরি ডিকসন মেনে প্রেম, পাপ, দুঃখ, যৌনতা, সমাজসমস্যা, যুগযন্ত্রণা ইত্যাদি নিয়ে কবিতার যান্ত্রিক উৎপাদনে আমাদের কোনো আকর্ষণ নেই...আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোনো চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই।[৪]

পুষ্কর দাশগুপ্তের কবিতা প্রসঙ্গে অনুপম মুখোপাধ্যায় সূত্রাকারে যথার্থই মন্তব্য করেছেন 'পুষ্কর দাশগুপ্তর আবহাওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে—

> ১। ষাটের দশকে পুষ্কর দাশগুপ্ত আন্তর্জাতিক কবিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ফলে খুব সহজেই সমসাময়িক বাংলা কবিতায় বেমানান হয়ে উঠতে পেরেছিলেন।...
>
> ৩। পুষ্কর দাশগুপ্ত পেরেছিলেন কবিতাকে একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রাব্য করে তুলতে, বলতে পারি ছবিতা।...
>
> ৮। কবিতার যে মানে হয় না—আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে তা স্বীকার করেছেন। শব্দের মানের বদলে ধ্বনিগুণকে দিয়েছেন মান্যতা।
>
> ৯। পংক্তি বিন্যাস আজও অনুসরণযোগ্য। পংক্তিগুলির মধ্যে সিমেন্টিং করছে শব্দের ধ্বনিগুণ।[৫]

এবার আলোচনা করে দেখব— পুষ্কর দাশগুপ্তের কবিতায় শ্রুতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য তথা কবিতার দৃশ্যরূপ সংক্রান্ত ভাবনাগুলি কীভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে শ্রুতির দশম সংকলনে প্রকাশিত ইশতেহারের প্রথম সূচিবদ্ধ বক্তব্যই ছিল— ১. নতুন ধরনের মুদ্রণ বিন্যাসের সাহায্যে কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) অনুষঙ্গ সৃষ্টি।[৬] পুষ্কর দাশগুপ্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এখানে আমি'-র (১৯৬৭) বিভিন্ন কবিতা থেকেই তার প্রকাশ আমরা দেখি—

> আমার প্রথম বই "এখানে আমি" (১৯৬৭, অব্যয়, ৪২ গড়পাড়া রোড, কলকাতা ৭০০০০৯) আমার "শ্রুতি" পর্বের কবিতা-ভাবনা, কবিতা সম্পর্কে উপলব্ধির ভিত্তিতে ব্যঞ্জক ভাষা-শিল্প, রচনা।[৭]

এই কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা 'প্রার্থনা'—

লক্ষ্য
আকাশের দিকে
পড়ে আছে তীরবিদ্ধ পাখি
হে পর্জন্য নিয়ে এসো অনাতপ নিবিড় করুণা

(প্রার্থনা, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ১৮)

এখানে কবি শব্দের অর্থের পাশাপাশি দৃশ্যরূপ (visual form) তৈরিতেও বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। ত্রিভুজের আকারে বিন্যস্ত এই কবিতা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যগুণে নয় বরং মূলভাবের সাথেও গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। ত্রিভুজের ঊর্ধ্বমুখী সূচালো চূড়া তীরের ফলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিভুজের নিচের দিক প্রশস্ত এবং উপরিভাগ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়া—তীরের ঊর্ধ্বগামী গতিমুখকেই দিকনির্দেশ করে। ত্রিভুজের চূড়ান্ত বিন্দু 'লক্ষ্য'—সেই আঘাতের মুহূর্ত, যেখানে তীর এসে বিঁধেছে এবং পাখি আহত হয়ে মাটিতে এসে পড়েছে। কবিতার দ্বিতীয় ছত্রটিকে (আকাশের দিকে) কবি ভাবের সাথে সাযুজ্য রেখে উপরের দিকে স্থান দিয়েছেন। স্বাধীন, মুক্তি-পিয়াসি, উড্ডীয়মান বিহঙ্গের তীরবিদ্ধ অবস্থা নিষ্ঠুরতা ও নৈতিক পতনকে প্রকাশ করেছে। পর্জন্য মেঘ ও বৃষ্টির দেবতা। হিংস্রতা বা ক্রোধের বিপ্রতীপে 'অনাতপ নিবিড় করুণা' সঞ্চার করার জন্য কবি দেবতা পর্জন্যের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন। এভাবে কবিতাটি নতুন ধরনের মুদ্রণ বিন্যাসের মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে উল্লেখযোগ্য।

১৯৬৯-এর ইশতেহারের দ্বিতীয় সূচিবদ্ধ বক্তব্য— ২. ছেদচিহ্নের বিলোপ। প্রয়োজন মতো স্পেস ও বিশেষ পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে কোথায় থেমে পড়তে হবে তার নির্দেশ। কবিতার ভাষায় মুখের কথার স্বাভাবিক ব্যঞ্জনাসৃষ্টি।[৮] পুষ্করের 'রাস্তা' কবিতায় এই ভাবনার যথার্থ প্রতিফলন দেখি। সম্পূর্ণ যতিচিহ্নহীন এই কবিতাটি যেন দীর্ঘ এক পথের অবয়বই ধারণ করেছে—

ট্রাম
বাস
গাড়ি
রাস্তা

দোকান
আলো
চিৎকার
রাস্তা
...
রাস্তা

(রাস্তা, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ৬৭)

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সুমিতা চক্রবর্তী 'রাস্তা' কবিতাটি পড়ে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন 'পদ্যপত্র'-এর অন্তর্ভুক্ত 'শ্রুতি নিয়ে' প্রবন্ধে—

> কবিতাটির দৃশ্যরূপে প্রলম্বিত পথ এবং বাক্যে না-বাঁধা শব্দগুলির বিন্যাসে সম্পর্কহীন বিশৃঙ্খল এক ভিড়ের ছবি ফুটে ওঠে। শেষ স্তবকে দেখি জনারণ্যের নির্জনতায় নিঃসঙ্গ পথিকমানুষের অসহায়তার রূপ। সাধারণত তাঁর কবিতা যতিচিহ্নহীন। পুষ্কর দাশগুপ্ত কবি-কল্পনা, অভিনিবেশ ও পরিশীলনের সংযোগ ঘটাতে পেরেছিলেন নিঃসন্দেহেই।[৯]

এই ইশতেহারে কবিতার মুদ্রণ-বিন্যাস সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে— ৩. অনুভবের অবলম্বন বিশেষ শব্দের গুরুত্ব অনুসারে তাকে অন্য শব্দের সঙ্গে জুড়ে বা বেশি স্পেস দিয়ে একেবারে আলাদা করে দেখানো; অথবা বিশেষ কোনো শব্দকে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হরফ থেকে আলাদা হরফে ছাপিয়ে তার প্রতি পাঠকের মনোযোগ

আকর্ষণ। কখনোবা শব্দের প্রতিটি বর্ণকে স্পেসের সাহায্যে বিছিন্ন করে দিয়ে গানের লয়ের মতো উচ্চারণবৈশিষ্ট্য তৈরি করা। সমস্ত মিলিয়ে কবির অনুভবের ক্রমভেদে উচ্চারণের ওঠানামার নির্দেশ দেওয়া।[১০] এই ভাবনার প্রতিফলন আমরা দেখি পুষ্করের 'শব্দ শব্দ' কাব্যের অন্তর্গত 'আগুন' কবিতায়—

জ্ব ল ছে
চোখ চোখের সামনে যা কিছু
আ গু ন
...
আগুন লাল নীল গোলাপি হলুদ শিখা
জ্বলছে সমস্ত শ রী র
জ্বলছে চো খ
...
জ্ব ল ছে জ্ব ল ছে
জ্ব ল ছে

(আগুন, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ৯২)

কবিতায় কবি ভাবের সাথে সংগতি রেখে বিশেষ চারটি শব্দের (জ্বলছে, আগুন, শরীর, চোখ) অন্তর্গত বর্ণগুলি অতিরিক্ত স্পেসের ব্যবহারের মাধ্যমে আলাদা করে দেখিয়েছেন। সর্বগ্রাসী আগুনের পরিব্যপ্তি ও প্রবাহমানতার বিষয়টিকে মান্যতা দিতেই কবি এরূপ স্পেসের ব্যবহার করেছেন— উদ্দেশ্য পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ।

প্রাগুক্ত ইশতেহারের চার নং নির্দেশক— ৪. ব্যাকরণের বিরোধিতা, ভাষা-ব্যবহারে বাক্যপ্রকরণের যুক্তি নির্ভরতার বর্জন। শব্দকে বাক্যের অংশ বা পদ হিসেবে না ভেবে প্রতিটি শব্দকে একক গুরুত্বে ব্যবহার করা। সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া-বিশেষণ, বিশেষণ ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় ভারসৃষ্টিকারী শব্দকে যথাসম্ভব পরিহার করা।[১১] স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে শ্রুতির কবিরা অহেতুক বর্ণনাত্মক ভাষা পরিহার করে এমন শব্দ ব্যবহারের উপর জোর দেওয়ার কথা বলছেন যা পাঠককে চমকিত করবে। কবিতার অবয়বে অহেতুক স্থূলতা বর্জন করে তাঁরা ক্ষীণ, মেদহীন কবিতা-শরীরের প্রত্যাশী— 'শব্দ শব্দ' কাব্যের অন্তর্গত 'টেবিলে' কবিতাটি যার সার্থক উদাহরণ।

টেবিলে
একটা ভাঙা গ্লাস
রঙচটা একটা ছাইদান
ছাই
...
একটা কলম
দোয়াত
কালি
...
ছেঁড়া একটা বই
খাতা
পেন্সিল

(টেবিলে, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ৬২)

এই কবিতাটি সম্পর্কে অনুপম মুখোপাধ্যায় 'পুষ্কর দাশগুপ্তর আবহাওয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন-

> যেকোনো শব্দই একটি ছবি। যেকোনো শব্দই আমাদের একটা ধারণার অবয়ব দেয়। একটা শব্দ ধ্বনিকেই চিহ্নায়িত করে। কবিতার মধ্যে শব্দ কখনো তার সমসাময়িক গুণে, কখনো মানব প্রজাতির স্মৃতির মূল্যে প্রবেশ করে। তার কাজ অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলা, সেই অনুভূতি পাঠকের মধ্যে কবির ইচ্ছা অনুসারে না-ও জাগতে পারে, না জাগাই অভিপ্রেত। পুষ্কর দাশগুপ্ত তাঁর কলমে ছবি এবং কবিতার ভেদ ঘুচিয়ে দিতে চেয়েছেন, একমাত্র এই কারণেই তিনি আমার নমস্য। কাজটা তিনি করেছেন সচেতনভাবে। প্রথমের দিনের সুখপাঠ্য কবিতা থেকে তিনি সরে এসেছেন নির্মোহ এবং একক এই অবস্থানে। ফলে ষাটের দশকে তিনি লিখেছেন ২০১৩ পেরিয়ে যাওয়ার কিছু কবিতা।[১২]

কবিতার অবয়বে দেখা যায় স্থূলতা যথাসম্ভব পরিহার করা হয়েছে। অহেতুক বর্ণনাত্মক ভাষা পরিহার করে একক শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষণীয়। কবিতাটি কথকের যাপন অভিজ্ঞতার এক-টুকরো ছবি যা তিনি মেদহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। 'টেবিল' শুধুমাত্র আসবাব হিসাবে না থেকে হয়ে উঠেছে জীবন-অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যবাহী। 'ভাঙা গ্লাস', 'রঙচটা একটা ছাইদান', 'ছাই' যেমন জীবনের ক্লান্তি, অবক্ষয়কে সূচিত করছে, পাশাপাশি 'কলম', 'দোয়াত', 'কালি' সৃষ্টি ও সৃজনশীলতার প্রতীক। নিজেকে দগ্ধ করেই সৃষ্টির সম্ভবনাগুলিকে তিনি নতুনরূপে বিকশিত করার পক্ষপাতী। স্বল্প অবয়বের এই কবিতায় টেবিলে শব্দের পাঁচবার পুনরাবৃত্তিও একই সাথে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এছাড়া কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টির জন্য একইসাথে সূক্ষ্ম ও স্থূল হরফের ব্যবহার পুষ্করের বেশ কিছু কবিতায় লক্ষণীয়, যেমন- 'এখানে আমি' কাব্যের 'বনের গভীরে আরো দূরে', শব্দ শব্দ' কাব্যের 'হয়ত কেউ', 'সবুজ দরজার সামনে', 'সারা রাত সারা দিন', 'পকেট', 'বাসে', 'কথা হাসি', 'হঠাৎ' এবং আরো অন্যান্য কবিতায়, 'কলিকাতা সমাচার' কাব্যের 'কলিকাতা সমাচার', 'মিস্টার কে প্রসঙ্গে', 'দিব্য ভ্রমণ' প্রভৃতি কবিতায়। 'বনের গভীরে আরো দূরে' কবিতায় স্বগোতোক্তির সুরে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছেন, যার উত্তর 'না'। নঞর্থকতার ইঙ্গিতবাহী 'না' শব্দটিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে কবি বোল্ড হরফ ব্যবহার করেছেন—

ওকি পাখির ডাক?
এবং না একথা বুঝতে পেরে
...
ওকি জলের শব্দ?
ওকি মেঘের?
হাওয়ার?
তখন **না** একথা
অনুভব করে...
ওকি ঝর্ণার শব্দ?
এবং না
একথা জেনে ঠাণ্ডা নীল আলোর বনের গভীরে
আরো দূরে একা

(বনের গভীরে আরো দূরে, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ২৭)

দৃশ্যরূপ সৃষ্টির প্রয়োজনে আবার কখনো কখনো স্পেসের ব্যবহার উহ্য রেখে করে শব্দকে পরপর জুড়ে কবিতায় স্থান দিয়েছেন বিভিন্ন কবিতায়। যেমন- 'শব্দ শব্দ' কাব্যের 'জ্বলুক', 'পতাকা ফেস্টুন পোস্টার', 'কথা হাসি' কবিতা। 'জ্বলুক' কবিতায় কী কী জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে—সেই অনুষঙ্গে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে স্পেসের ব্যবহার না করে পরপর রেখে কবিতায় স্থান দিয়েছেন—

পেট্রোল স্পিরিট বারুদ
না
তবে কয়লাকাঠকেরোসিনপেট্রোলস্পিরিটবারুদ
সব
আর দেশলাই
...
জ্বলে যাক দোকানপাটবাড়িঘরবাসট্র্যাম
...
গাড়িঘোড়ালোকজন
কাপড়জামাশার্টপ্যান্টধুতিপাঞ্জাবিশাড়িব্লাউজজুতোমোজা
পথঘাটশহরগ্রামমাঠঘাটগঞ্জবাজার
...
শব্দের ওপরে শব্দের তলায়
শব্দের পাশে শব্দশব্দশব্দশব্দ

(জ্বলুক, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ৮৫-৮৬)

প্রবীর রায়কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে পুষ্কর দাশগুপ্ত বলেছেন—

> শ্রুতি ছিল ব্যক্তি-লেখকের অনন্য, নিজস্ব, ব্যক্তিগত লিখনের সন্ধান। পাশাপাশি গতানুগতিক দার্শনিকতা আর কাব্যিকতা পেরিয়ে আধুনিক কবিতার নির্মাণের প্রয়াস। বাংলা কবিতা ইংরেজি আর রাবীন্দ্রিক রোমান্টিকতার সীমা আজও পেরোতে পারে নি, শ্রুতি ছিল ওই সীমা পার হওয়ার একটা প্রয়াস।[১৩]

শ্রুতির বিভিন্ন সংকলনে তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। শ্রুতির অষ্টম সংকলনে প্রকাশিত 'পাখিরা' কবিতার কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। 'পাখিরা' কবিতার স্তবক বিন্যাসের বৈচিত্র্য পাঠককে আকর্ষিত করে। দুইভাবে এই কবিতায় কবি স্তবক নির্মাণ করেছেন। প্রথম তিনটি স্তবক যতটা সম্ভব আঁটসাঁট গড়নে পরপর সমান্তরালে স্থান দিয়েছেন, শেষ স্তবকটি ঠিক ততটাই ছড়ানো। স্পেসের ব্যবহারে পাখিদের উড্ডীয়মানতার একটা আভাস ফুটে উঠেছে স্তবকের অন্তর্গত শব্দগুলির বিন্যাসের মধ্য দিয়ে—

দিনের আলো
সন্ধ্যার কুয়াশা
রাতের আঁধার
আর পাখিরা

এক পৃথিবী
দুই আকাশ

তিন সময়
আর পাখিরা

সময় তিন আকাশ দুই পৃথিবী এক
আঁধার রাতের কুয়াশা সন্ধ্যার আলো দিনের
ফুল গাছের গাছ বনের ঘাস মাঠের
আর পাখিরা
হঠাৎ পাখিরা[১৪]

পুষ্করের কিছু কবিতায় দেখা যায় কবিতার বিষয়ের সাথে দৃশ্যরূপ একেবারে এক হয়ে প্রকাশিত। 'শব্দ শব্দ' কাব্যের অন্তর্গত 'দরজা পেরিয়ে' কবিতায় সিঁড়ি ভাঙার অনুষঙ্গে ব্যবহৃত ছত্রগুলিকে কবি সাজিয়েছেন সিঁড়ির ধাপের মতোই ক্রমশ অবতরণশীল করে—

দরজা বারান্দা দরজা
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি
সিঁড়ি দরজা
গলি রিক্সা বাঁদিকে ট্যাক্সি ডানদিকে
(দরজা পেরিয়ে, কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু, পৃ. ৮৩)

'শব্দ শব্দ' কাব্যটি প্রকাশ হয় ১৯৭১ সালে। এর পূর্বে অবশ্য কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬২-তে প্রকাশিত 'যত দূরেই যাই' কাব্যের 'ফিরে ফিরে' কবিতায় এই একই রূপবন্ধের ব্যবহার করেছেন—

সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে আমি নামছি
নামছি
নামছি।[১৫]

সমালোচক পশুপতি শাশমল 'কবিতার দৃশ্য রূপ: তত্ত্বে ও প্রয়োগে' প্রবন্ধে এই কবিতার রূপবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

> এই দৃশ্য রূপবন্ধটি সমগ্র কবিতার আদি-মধ্য-অন্ত তিনটি পর্যায়েই মোট তিনবার বিন্যস্ত হয়েছে। চোখে পড়া মাত্রেই গোটা কবিতাকে ক্রমাগত অবতরণশীল দেখায়। বলা প্রয়োজন, এই ক্রমিক অবতরণের— ধারাবাহিক নেমে যাওয়ার দৃশ্য রূপটি কবিতার বিষয়নিহিত ভাবেরই সদৃশ। ভাবের পলতে উসকে দিয়ে আগুন ধরাল রূপবন্ধ, জ্বলে উঠল রসের আলো; রূপবন্ধের খাত ধরে বয়ে আসছে ভাবের মন্দাকিনী, জেগে উঠছে রসের প্রবাহ। দুটো উপায়েই এ রূপবন্ধ প্রাসঙ্গিক।[১৬]

এই ধরনের আরেকটি কবিতা 'দাঁড়িয়ে আছি' যেখানে বিষয় ও দৃশ্যরূপে অভিন্নতা প্রকাশিত। কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সাজিয়ে কবি দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষের অবয়ব তৈরি করেছেন। দ্বিপ্রহরিক নির্জনতায় একলা, নিঃসঙ্গ মানুষের প্রতীক্ষার ছবিই এই কবিতাটির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। দেবাশিস ভট্টাচার্য 'শ্রুতি' পত্রিকা ও পুষ্কর দাশগুপ্ত-র কবিতা' প্রবন্ধে বলছেন—

> দাঁড়িয়ে থাকা এক মানুষের প্রতীক্ষার ছবি এ কবিতায় যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে একই সঙ্গে ধ্বনিময়তায় ও দৃশ্যময়তায়। এই রীতির কবিতা লেখার পশ্চাতে গিয়োম আপলিনের-এর কবিতার ছায়া পাওয়া যাবে। আপলিনের-এর 'কালিগ্রাম' কাব্যে এই ধরনের বেশকিছু 'চিত্র-কবিতা' স্থান পেয়েছে।[১৭]

অনুবাদক হিসাবেও পুষ্কর দাশগুপ্তের খ্যাতি ছিল। তিনি যে কতটা প্রভাবিত ছিলেন গিয়োম আপলিনের দ্বারা, তা তাঁর অনূদিত কবিতাগুলি থেকেই বোঝা যায়। কংক্রিট কবিতার অন্বেষণে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আপলিনের-কে। আপলিনের কবিতার তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ পাঠক। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি আপলিনের কবিতার চিত্রধর্মীতা হুবহু বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। তিনি আপলিনের 'Il Plute' কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন 'বৃষ্টি পড়ে' শিরোনামে—

> কবিতাটির অক্ষর-উপস্থাপনা ওপর থেকে নিম্নাভিমুখী, কিছুটা তির্যক এবং উল্লম্বক-বৃষ্টির বারি-ধারা পতনের দৃশ্যরূপ। জলের ফোঁটার মত বর্ণ দিয়ে এই বৃষ্টিধারার মতো বিন্যাস পরবর্তী কালে বাংলা কবিতার ও দু-একজন কবির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলেছে। শ্রুতি-র প্রবক্তা কবি পুষ্কর দাশগুপ্ত তো চিত্রধর্মিতা সহ কবিতাটির অনুবাদ করেছেন।[১৮]

কবিতার প্রকরণ সংক্রান্ত ভাবনায় পুষ্করের উপর গিয়োম আপলিনেয়ারের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন সৈয়দ কওসর জামাল 'আমাদের পুষ্করদা, কবি পুষ্কর দাশগুপ্ত' শিরোনামে 'এবং মুশায়েরা' সংকলিত পুষ্কর দাশগুপ্ত সংখ্যায়—

> গিয়োম আপলিনের তাঁর কোনো কবিতায় কোনো কমা, সেমিকোলন বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করেননি। পুষ্করের কবিতাতেও এমন ধারা আমরা লক্ষ করেছি। আপলিনের-এর কবিতার পাশে পুষ্করের কবিতা রেখে আলোচনা করা সম্ভব প্রকরণগতভাবে তাঁরা কতটা কাছাকাছি ছিলেন, কিংবা মিলটুকু শুধুই প্রকরণের, আত্মিক দিক থেকে সত্যিই তাঁদের মিল ছিল না।[১৯]

এই আলোচনার মধ্য দিয়ে কবি পুষ্কর দাশগুপ্তের দৃশ্যরূপ সংক্রান্ত ভাবনার একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা উপস্থাপনের চেষ্টা করলাম। পুষ্কর দাশগুপ্তের কবিতা সম্পর্কিত ভাবনা, লেখা কবিতাগুলি পর্যালোচনা করলে একটি বিষয় স্পষ্ট যে তিনি পাঠককে বসিয়েছেন একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীর আসনে। সেখানে পাঠকের কাজ কেবল কবিতা পড়া নয়, বরং আপন বোধ-বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কবিতাকে আবিষ্কার করা, রহস্যের উন্মোচন এবং যথার্থ অনুধাবনের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করা। এখানেই পুষ্কর দাশগুপ্তের সার্থকতা।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, দেবাংশু। কবি কবিতা কাব্যতত্ত্ব। বর্ণমেলা, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১৩।
২. পাল, অর্পণ (সম্পাদনা)। পদ্যপত্র। বিশেষ সংখ্যা শ্রুতি সংকলন ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৩২।
৩. ঘোষ, দেবাংশু। কবি কবিতা কাব্যতত্ত্ব। বর্ণমেলা, ২০১৫, কলকাতা, পৃ. ১১৫।
৪. তদেব, পৃ. ১১৬-১১৭।
৫. পাল, অর্পণ (সম্পাদনা)। পদ্যপত্র। বিশেষ সংখ্যা শ্রুতি সংকলন ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৭৯।

৬. বসুচৌধুরী, মৃণাল (সম্পাদনা)। শ্রুতি। দশম সংকলন, মার্চ ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ২।
৭. দাশগুপ্ত, পুষ্কর। কিছু কবিতা কিছু পাঠ্যবস্তু কয়েকটা দৃশ্য পাঠ্যবস্তু। এবং মুশায়েরা, ২০২১, কলকাতা, 'প্রসঙ্গত' অংশ।
৮. বসুচৌধুরী, মৃণাল (সম্পাদনা)। শ্রুতি। দশম সংকলন, মার্চ ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ২।
৯. পাল, অর্পণ (সম্পাদনা)। পদ্যপত্র। বিশেষ সংখ্যা শ্রুতি সংকলন ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ৭৭।
১০. বসুচৌধুরী, মৃণাল (সম্পাদনা)। শ্রুতি। দশম সংকলন, মার্চ ১৯৬৯, কলকাতা, পৃ. ২।
১১. তদেব, পৃ. ২-৩।
১২. পাল, অর্পণ (সম্পাদনা)। পদ্যপত্র। বিশেষ সংখ্যা শ্রুতি সংকলন ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ১৭৫।
১৩. সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা)। এবং মুশায়েরা। ক্রোড়পত্র পুষ্কর দাশগুপ্ত জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, ৩০তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ৪৩।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সজল, মণ্ডল পরেশ (সম্পাদনা)। শ্রুতি। অষ্টম সংকলন, জুলাই ১৯৬৮, কলকাতা, পৃ. ২৮।
১৫. রায়চৌধুরী, সুবীর (সম্পাদনা)। কবিতাসংগ্রহ ২ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ৭৯।
১৬. শাশমল, পশুপতি, শাশমল, অতনু (সংকলন ও সম্পাদনা)। প্রবন্ধ অষ্টাবিংশতি। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বইমেলা ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ৪৮।
১৭. সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা)। এবং মুশায়েরা। ক্রোড়পত্র পুষ্কর দাশগুপ্ত জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, ৩০তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ৯৪।
১৮. পাল, অর্পণ (সম্পাদনা)। পদ্যপত্র। বিশেষ সংখ্যা শ্রুতি সংকলন ২০১৪, কলকাতা, পৃ. ২০৬।
১৯. সামন্ত, সুবল (সম্পাদনা)। এবং মুশায়েরা। ক্রোড়পত্র পুষ্কর দাশগুপ্ত জ্যোৎস্নাময় ঘোষ, ৩০তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩, কলকাতা, পৃ. ২২।